আনন্দবাজার পত্রিকা
২০ জুন, ২০১৫, শনিবার

কাম ঈর্ষা ক্ষমতালিপ্সা

চরমপন্থীদের মধ্যেও দুর্লভ নয়। বারীন ঘোষ কি এমনই ছিলেন? নথি ঘাঁটলেন ইতিহাসবিদ

র জ ত কা ন্ত রা য়

'আত্মকথায়' নিজ পরিচয় দিতে গিয়ে নাটকীয়ভাবে 'বোমাড়ে' শব্দটি অরবিন্দ ভ্রাতা বারীন্দ্র কুমার ঘোষ ব্যবহার করেছিলেন।

আর 'বোমা' শিরোনামে চমকপ্রদ এক নাটক আমরা পেলাম নাটককার ব্রাত্য বসুর কলম থেকে।

তিনি ইতিহাস-মনস্ক নাটককার। এর আগেও তিনি রচনা করেছিলেন 'রুদ্ধসংগীত'। 'রুদ্ধসংগীত' ও 'বোমা' বাংলার দুটি ভিন্ন ভিন্ন ঐতিহাসিক আন্দোলনকে কেন্দ্র করে রচিত।

গণনাট্য সংঘ ও বিখ্যাত রবীন্দ্রসংগীত গায়ক দেবব্রত বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে 'রুদ্ধসংগীত' রচিত হয়েছিল। আর 'বোমা' মঞ্চস্থ করা হয়েছে অরবিন্দ, বারীন্দ্র ও আলিপুর বোমা মোকদ্দমা ঘিরে।

এই মোকদ্দমাকে কেন্দ্র করে যে আন্দোলন জনসমক্ষে প্রকাশ হল, চার্লস টেগার্টের ভাষায় তার নাম 'সন্ত্রাসবাদ' আর হেমচন্দ্র দাস কানুনগোর বর্ণনায় ওই একই ঘটনার নাম 'বিপ্লবপ্রচেষ্টা'। নাটককার দুটি বিপরীত দৃষ্টিকোণকেই লক্ষ্যে রেখেছেন, আর মঞ্চে নতুন এক ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করেছেন।

উক্ত দুটি নাটক, 'ইতিহাস ও নাট্য'র সম্বন্ধ নিয়ে ভাবনার অনেক খোরাক জোগায়। 'বোমা' ঐতিহাসিক নাটকের পর্যায়ে পড়ে। 'রুদ্ধসংগীত'ও তাই। কিন্তু ঐতিহাসিক নাটকের মধ্যেও স্তরভেদ আছে। 'রুদ্ধসংগীত' ও 'বোমা' একই জাতের নাটক। পক্ষান্তরে, মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক বা গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'সিরাজদৌলা' ও 'মীরকাশিম' অন্য জাতের নাটক। যদিও এগুলিও ঐতিহাসিক নাটকের অন্তর্গত। তুলনামূলক বিচারে, ঐতিহাসিক নাটকের মধ্যে দুটি আলাদা জাত চোখে পড়ে।

এক জাতের নাটক হল ইতিহাসাশ্রিত নাটক, এতে ইতিহাস ও কল্পনা প্রচুর পরিমাণে মিশ্রিত থাকে। আর এক জাতের নাটক ইতিহাস-প্রধান নাটক, তাতে কল্পনার পরিসর স্বল্প। এ জাতের নাটক ইতিহাস অধিকৃত নাটক, প্রায় পুরোটাই ইতিহাসের উপর নির্ভর করে রচিত। নাটকের বিবর্তনে ক্রমে ইতিহাসাশ্রয়ী নাটক আসে প্রথমে, তার পরে উদয় হয় ইতিহাস-অধিকৃত নাটকের।

বাংলা নাটকের ইতিহাস আলোচনা করলে এই বিবর্তন পরিস্ফুট হবে। প্রায় প্রথম দিকেই ইতিহাস বিপুল নিনাদে বাংলা মঞ্চে ঢুকে পড়েছিল। মধুসূদন উপহার দেন 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক। পরবর্তীতে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় রচনা করেন 'চন্দ্রগুপ্ত' ও 'সাজাহান', তা ছাড়া গিরিশচন্দ্রের বহু জনপ্রিয় 'সিরাজদৌলা' তো ছিলই। এই সমস্তই কিন্তু ইতিহাসশ্রয়ী নাটক ছিল, তাতে ইতিহাস-রস প্রচুর পরিমাণে নিষিক্ত থাকলেও প্লট ও চরিত্রগুলি ছিল মূলত কল্পনানির্ভর।

পক্ষান্তরে, ইদানিংকালের 'রুদ্ধসংগীত' বা 'বোমা'তে কিছু

কল্পনা মিশানো থাকলেও প্লট প্রায় সবটাই বাস্তব এবং চরিত্রগুলি প্রায় সমস্তই সত্যিকারের।

প্রথমে 'রুদ্ধসংগীত' নাটকের দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক। এর বিষয়বস্তু হল দেবব্রত বিশ্বাসের গণনাট্য সংঘে যোগদান ও পরবর্তী কালে সংঘ ত্যাগ, কমিউনিস্ট পার্টি থেকে বেরিয়ে আসা, বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ডের সঙ্গে বিবাদ এবং তা সত্ত্বেও খ্যাতির তুঙ্গে আরোহণ। মঞ্চে বিতরিত 'ব্রোশারে' দেখি—'দেবব্রত তো আছেনই, আরও আছেন হেমাঙ্গ বিশ্বাস, সলিল চৌধুরী, ঋত্বিক ঘটক, শম্ভু মিত্র, বিজন ভট্টাচার্য, তৃপ্তি মিত্র, জ্যোতি বসু, প্রমোদ দাশগুপ্ত, সুচিত্রা মিত্র, মঞ্জুশ্রী চাকি সরকার, সন্তোষ কুমার ঘোষ প্রমুখ।' নাটকের মুল সুর বাম সংস্কৃতি আন্দোলনের প্রতি কড়া, কিন্তু সে সমালোচনা স্পষ্টতই রীতিমতো তথ্যনির্ভর।

এবার ব্রাত্য বসুর নতুন প্রচেষ্টা 'বোমা'র দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক। ইংরেজদের গোয়েন্দা পক্ষের সব অফিসার—স্টিভেনসন মূর, ফ্রেডরিক হ্যালিডে, চার্লস টেগার্ট—এঁরা সকলেই ১৯০৮ সালে মানিকতলার ধরপাকড়ে সফল ও দক্ষ অফিসার রূপে উপস্থিত ছিলেন।

অপর পক্ষে যুগান্তর দলের নেতৃবৃন্দ—অরবিন্দ ঘোষ, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, হেমচন্দ্র দাস কানুনগো—এঁরাও বাঙালির কাছে সুপরিচিত 'টেররিস্ট'/'বিপ্লবী'। থিয়েটার বিতরিত ব্রোশার থেকে আমরা জানতে পারি : "এই নাটকের সমস্ত চরিত্রই ঐতিহাসিক, একজন মাত্র নয়। সে কল্পনা।" কাল্পনিক চরিত্র বলেই কি ব্রাত্য এঁর নামকরণ করেছেন কল্পনা?

ঘটনাবলি কতটা ইতিহাসসম্মত? সংলাপ, দৃশ্যপট ইত্যাদি কাল্পনিক হলেও মূল স্ক্রিপ্ট কিন্তু প্রায় সম্পূর্ণই ইতিহাস অবলম্বন করে রচিত। সে কথা বলতে গেলে, স্বয়ং 'থুকিডিডিস' ও তাঁর 'পেলোপোনেশীয় যুদ্ধের ইতিহাস'-এ কাল্পনিক সংলাপ জেনে শুনে (এবং নিজে থেকেই স্পষ্টভাবে জানিয়ে শুনিয়ে) ব্যবহার করেছিলেন। বলা হয় এইটিই জগতের প্রথম কল্পনা-বিবর্জিত 'অবজেকটিভ' অর্থাৎ বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস। থুকিডিডিস ঐতিহাসিক চরিত্রগুলির মুখে অবস্থান্তরে যে সংলাপগুলি বসিয়েছিলেন, সেগুলি ঘটনাকালের সম্ভাব্য সংলাপ।

এই নাটকে সেই পন্থা অনুসরণ করে নাটককার বাস্তবতার হানি করেননি। জায়গায় জায়গায় 'ওভার অ্যাক্টিং'-এর ফলে মঞ্চে মেলোড্রামা আমদানি হয়েছে, কিন্তু স্ক্রিপ্টের প্রশংসনীয় অথেনটিসিটি (অর্থাৎ বিশ্বস্ততা ও বিশ্বাসযোগ্যতা) তার অন্তর্নিহিত শক্তি নিয়ে বজায় রয়ে গিয়েছে।

সন্ত্রাসই বলুন বা বিপ্লবই বলুন, বোমার রাজনীতি সম্বন্ধে ব্রাত্য বসুর অস্বস্তি রবীন্দ্রনাথের চার অধ্যায় স্মরণ করিয়ে দেয় বারে বারেই। 'চার অধ্যায়'-এর ঘটনা কাল্পনিক, 'বোমা'র ঘটনা বাস্তবে ঘটেছিল।

বোমাড়ে দলের রাজনীতিতে নিছক নিঃস্বার্থতা, আত্মত্যাগ, একাগ্রতা, ব্রহ্মচর্য বা দেশাত্মবোধ ছাড়া কিছু ছিল না ভাবলে ভুল হবে। গবেষণাকারী নাটককার স্পষ্টই নাটকের চরিত্রগুলির অন্তর্লীন সম্পর্কে হিংসা, লোভ, কাম, ঈর্ষা ও ক্ষমতালিপ্সার অস্তিত্ব দেখিয়েছেন।

এ সব কি সত্যি?

বিপ্লবীদের প্রাণপণ আদর্শবাদ বিবৃত করেও, সত্যান্বেষী ব্রাত্য বলছেন, সত্যি। তাই বটে। বর্তমান সমালোচকও কলকাতা পুলিশের ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের গুপ্ত দলিলগুলি দেখে একই সিদ্ধান্তে আসতে বাধ্য হয়েছেন।

একটা গল্প বলি। গল্প নয়, সত্যি। অরবিন্দ ঘোষ বরোদা থেকে বাংলায় বিপ্লব ঘটানোর উদ্দেশ্যে নিজের অনুগত সৈনিক যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে কলকাতায় ও মেদিনীপুরে পাঠিয়েছিলেন। মেদিনীপুরে ছিলেন অরবিন্দর আত্মীয় সত্যেন বসু। যতীন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রনাথকে দিয়ে মেদিনীপুরে একটি গুপ্ত সমিতি স্থাপন করান। এতে আশ্বস্ত না হয়ে অরবিন্দ আবার পাঠালেন নিজের ভাই বারীন্দ্রকুমার ঘোষকে। বারীন্দ্র প্রথমেই যতীন্দ্রনাথকে সরাবার উদ্যোগ করলেন। যতীন্দ্রনাথ এক আত্মীয়ার সঙ্গে গুপ্ত সম্পর্কে লিপ্ত আছেন, এই অভিযোগ তুললেন অরবিন্দর কাছে বারীন। অরবিন্দ যতীন্দ্রনাথের বক্তব্য না শুনেই তাঁকে বরখাস্ত করলেন।

ঈর্ষাকাতর, ক্ষমতালিপ্সু বারীন্দ্রকুমার লাগলেন তাঁর আত্মীয় সত্যেন বসুর পেছনে। এবারেও ওই একই নারীর সঙ্গে গুপ্তভাবে লিপ্ত থাকার অভিযোগ তুললেন সত্যেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে। তখনকার মতো গুপ্ত সমিতি ভেঙে গেল।

এ সব ১৯০০ ও তার অব্যবহিত পরের ঘটনা। ১৯০৫ সালে কলকাতায় এসে অরবিন্দকে নতুন করে সমিতি গঠন করতে হল। তাতেও ভ্রাতৃপ্রীতি ঘুচল না। প্রকারান্তরে এমন এক ঘটনা মঞ্চে উপস্থাপিত হয়েছে 'বোমা' নাটকে।

পরিবেশ বলা দরকার, অরবিন্দ চরিত্রটি ব্রাত্য শ্রদ্ধা সহকারে উপস্থাপন করেছেন। তবু সংলাপের মধ্যে রেখে দিয়েছেন একটা প্রশ্ন। ছাড়া পেয়ে বিপ্লব প্রচেষ্টা ছেড়ে অরবিন্দ দিব্যজীবন সন্ধানে পুদুচেরী চলে যান। অন্য শাস্তি পাওয়া ষড়যন্ত্রীদের মুখে এই প্রশ্ন ওঠে যে, সবাই শাস্তি পেলেন, কিন্তু দলনেতা কেন ছাড়া পেলেন?